দুঃশাসন

অনেকক্ষণ ধরে তীর্থের কাকের মতো বসে আছে লোকটা। সুতরাং অভিনয় পর্বটা তাড়াতাড়ি শেষ করাই ভালো। খাতা থেকে মাথাটা তুলে অল্প একটু ঘাড় বেঁকিয়ে দেবীদাস বললেন, তারপর?

লোকটা প্রায় হাউ হাউ করে উঠল। চোখের কোণে চিক চিক করছে জল। বললে, আর তো মান-ইজ্জত থাকে না বাবু। একটা ব্যবস্থা না করলে—

—ব্যবস্থা—ব্যবস্থা? অন্যমনস্কের মতো দেবীদাস কলমটাকে কামড়ে ধরলে, তারপর খোলা জানালা দিয়ে তাকাল বাইরের দিকে। ছোট নদীর খেয়া পার হয়েই ধুলোয় ভরা পথটা হারিয়ে গেছে ধু-ধু করা দিকচিহ্নহীন মাঠের ভেতর, প্রখর সূর্যের আলোয় নিজেকে মেলে দিয়েছে নগ্ন অনাবৃত পৃথিবী। এক সার বন-ঝাউয়ের গাছ হাওয়ায় যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

অন্তত এক জোড়া কাপড় নইলে আর—

কাপড়?—দেবীদাস যেন চমকে জেগে উঠেছে ঘুম থেকে : কাপড় পাওয়া যাবে কোথায়? চালান নেই। সব সাফ করে বসে আছি। ব্যবসা-বাণিজ্য গেল—লোকেরও দুর্গতির একশেষ।

লোকটা তবু নাছোড়বান্দা। দেবীদাসের পা আঁকড়ে ধরল দু'হাতে। চোখ দিয়ে এবার তার টপটপ করে জল পড়তে শুরু করেছে : আপনি ইচ্ছে করলে সব হয় বাবু। এক জোড়া কাপড়ও কী গদী থেকে বেরুবে না?

অসীম বিরক্তিতে সমস্ত শরীর শির শির করে শিউরে উঠল—লোকটাকে যেন একটা লাথি মারতে পারলে মনটা খুশি হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছুই করলেন না দেবীদাস। ভারী গলায় বললেন, কী করবি বল—সবই ভগবানের মার। কেন যে এই যুদ্ধ বাধল আর আকাল দেখা দিল এক ভগবানই বলতে পারেন সে কথা। কাপড় থাকলে কি আর তোকে দিতাম না? আমার কাজই তো ব্যবসা করা—ঘরে মাল পচালে আমার কোনো লাভ আছে বলতে পারিস?

না, লাভ নেই। এক জোড়া কাপড়ের জন্য পা আঁকড়ে পড়ে থাকলেও লাভ নেই কিছু। জলভরা চোখে লোকটা পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল খানিকক্ষণ, তারপর উঠে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

ভাইপো গৌরীদাস এককোণে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। এইবার চোখ তুলে বললেন, ওকে অন্তত একখানা—

—খেপেছিস তুই? দেবীদাস ভ্রুভঙ্গি করলেন, ওকে একখানা দিলে দু-ঘণ্টার মথ্যেই গোরগোড়ায় উল্টোচণ্ডীর মেলা বসে যেত না? ও ব্যাটাদের কাছ থেকে এক পয়সাও তো আর বেশি নেবার উপায় নেই। পর পর কতগুলো মামলা হয়ে গেল—দেখছিস না?

—তা বটে!—গৌরীদাস আবার খবরের কাগজে মন দিলে।

দেবীদাস খোলা জানালার পথে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল। রিক্তশ্রী পাণ্ডুর পৃথিবী, বৈশাখের রোদ যেন শ্যামলতার শেষ চিহ্নটুকুও মুছে নিয়ে গেছে। জ্বলন্ত আকাশটার তলা দিয়ে উড়ে চলেছে 'সামকল' পাখির ঝাঁক—পিপাসায় কাতর হয়ে কোনো সুদূর বিল কিংবা জলার সন্ধানেই চলেছে হয়তো। মেটে পথটার ওপর হাওয়ায় ধুলোর ঘূর্ণি উড়ছে—শাঁ শাঁ করে শব্দ করছে বন ঝাউয়ের দল। কোনোখানে একটি মানুষ নেই—যেন শশ্মান।

এপাশে ছোট গাঁয়ের ছোট বন্দর। দেবীদাসের কোঠাবাড়ির পেছনে আর সব দীনতায় ম্লান হয়ে আছে। টিনের চাল, চাঁচের বেড়া। করোগগেটের টিন জ্বলছে শানানো ইস্পাতের মতো। আমগাছের নিচে গরুর গাড়ি বিশ্রাম করছে। অনেক দূরে থানার লাল রঙের বাড়িটা—দেবীদাসের দোতলা থেকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওটাকে। রুক্ষ মাটির বুক ফুঁড়ে যেন একটা রক্তজবা ফুটে উঠেছে।

ছোট গাঁয়ের ছোট বন্দরে বড় ব্যবসায়ী দেবীদাস। কাপড়ের আড়তদার সে—খুচরো পাইকারী সবই চলে। আশপাশের আট-দশখানা হাট তারই কৃপার ওপর নির্ভর করে থাকে; কিন্তু এবার এসে অনুগ্রহের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করতে হয়েছে দেবীদাসকে। চালান নেই। যে মাল যোগাড় করা যায়, সরকারি দরে বিক্রি করতে গেলে পড়তা পোষাবে না। অতএব দোকানে ডবল তালা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকাই ভালো। ব্যবসাও নেই—প্রফিটিয়ারিংয়ের বিড়ম্বনার হাত থেকে মুক্ত।

গৌরীদাস কিন্তু অস্থিরভাব উসখুস করছে। এখনো সত্যিকারের ব্যবসাদার হয়ে ওঠেনি, তাই মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারছে না ব্যাপারটাকে। সভয়ে একবার দেবীদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে বললে, কিন্তু এভাবে চলবে কদিন? যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে—

দু চোখে হঠাৎ আগুন জ্বলে গেল দেবীদাসের। কোনো কারণ নেই—হঠাৎ দপ দপ করে উঠল চোখের তারা দুটো। বাইরের জ্বলন্ত পৃথিবী থেকে খানিকটা জ্বালা কি প্রতিফলিত হয়ে পড়ল?

স্থির গলায় দেবীদাস প্রশ্ন করলেন, কী করতে হবে?

—না, কিছু না—অখণ্ড মনোযোগসহকারে গৌরীদাস একটা সাবানের

বিজ্ঞাপন পড়তে লাগল : স্বনামধন্য অভিনেত্রী চঞ্চলা দেবী বলেন—

ঝনাৎ করে নিচে একখানা সাইকেল আছড়ে পড়ল।

তারপরেই দোতলার সিঁড়িতে টক টক করে ভারী জুতোর শব্দ। বীর-পদদাপে সমস্ত বাড়িটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে তেতলায় উঠে আসছে কেউ। আর যেই হোক অন্তত চোখের জলে একজোড়া কাপড়ের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে আসছে না নিশ্চয়ই। তারা আসে ভিক্ষুকের মতো—ছায়ার মতো নিঃশব্দে পা ফেলে। গদির বাইরে দাঁড়িয়ে তিনবার দেবীদাসকে সেলাম করে তারা।

তিন বছর আগে? তখন ছিল অন্যরকম। এক জোড়া পছন্দ না হলে দশ জোড়া নামানো হতো।

থানার এল. সি. কানাই দে এসে ঘরে ঢুকল। চৌদ্দ টাকা মাইনের সাধারণ কনস্টেবল, কিন্তু সেরেস্তার খাতা লেখে বলে মুহুরীবাবু নামে সে সম্মানিত। দরকার হলে পাগড়ি বেঁধে লাঠি হাতে পাহারাও দিতে হয়। তবু নিজের সম্বন্ধে কানাই দের একধরনের আভিজাত্যবোধ আছে। দু-এক বছরের মধ্যে সে যে জমাদার হয়ে যাবে এ প্রায় পাকাপাকি খবর।

রোদের চাইতে তেতে-ওঠা বালির তেজটা প্রবল। কানাই দের গলার স্বর যেন এস. পি-র মতো উদাত্ত আর গভীর : কি হে সরকার, ফুলছ কেমন?

অভ্যর্থনা করার আগেই সশব্দে একখানা চেয়ারে আসন নিলেন কানাই দে। লোকটার ধরনধারণ দেখলে পিত্তি চড়ে যায় দেবীদাসের। কিন্তু যা সময় পড়েছে এখন শত্রু বাড়ানো কোনো কাজের কথা নয়। চারিদিকে অসংখ্য রন্ধ্র, যে কোনোটার ভেতর দিয়ে শনি প্রবেশ করতে পারে!

উত্তরে খানিকটা কাষ্ঠ হাসি হাসলে দেবীদাস। তারপর এগিয়ে দিলে সিগারেটের প্যাকেটটা।

অভিজাত-ভঙ্গিতে ঠোঁটের একপাশে সিগারেট ধরে সেটাকে জ্বালাল কানাই দে। একটা চোখ বন্ধ করে তাকাল বিচিত্র তীর্যক দৃষ্টিতে। যেন আগেই জমাদার হওয়ার জন্য মহড়া দিয়ে নিচ্ছে : এই বারে পঞ্চাশ টাকা বার করো দেখি। চাঁদা।

পঞ্চাশ টাকা?—বিস্ফারিত চোখে দেবীদাস বললেন—পঞ্চাশ টাকা চাঁদা?

—আলবৎ। সমুদ্র থেকে এক আঁজলা।—বন্ধ চোখটাকে আধখানা খুলে কানাই দে বললেন : দারোগাবাবু শচীকান্ত বলে দিয়েছেন।

ক্ষুব্ধ স্বরে দেবীদাস বললে, এ জুলুম।

—জুলুম,—সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে নিঃশব্দে যতখানি হেসে ওঠা যায়, সেই পরিমাণে কানাই দে হাসল। বললে, পাঁচ পয়সার গাঁজাতেই শিব তুষ্ট থাকেন, কিন্তু তাতেই যদি হাতমুঠো করে বসো তা হলে দক্ষযজ্ঞ বাধতে পারে জানো তো সরকার?

—হুঁ—দেবীদাস আবার চুপ করে রইল। শুধু পাঁচ পয়সার গাঁজাই? এই

ছোট বন্দরে সৃষ্টি-স্থিতি লয়ের যিনি দেবতা, সেই শিবটির খাঁই যে পাঁচ পয়সার চাইতে অনেক বেশি, সে কথা যেমন দেবীদাস জানে, কানাই দেও তার চাইতে এতটুকু কম জানে না। কিন্তু কী হবে সে কথা বলে।

পঞ্চাশ টাকা নিয়ে কানাই দে উঠল। অন্যমনস্কভাবেই যেন সিগারেটের বাক্সটাকে পুরে নিলেন নিজের পকেটে। বললে, সন্ধ্যাতেই যাত্রার আসর বসবে। যেয়ো কিন্তু। দারোগাবাবু বারবার করে বলেন দিয়েছেন।

ক্লিষ্ট স্বরে দেবীদাস জবাব দিলেন, আচ্ছা।

বীরপদদাপে সিঁড়ি আর ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে নিচে নেমে গেল কানাই দে। উৎকীর্ণ হয়ে দেবীদাস যেন শুনতে লাগল বিলীয়মান শব্দটা; এ জুলুম—অসহ্য জুলুম। থানায় যাত্রা হবে—দারোগাবাবুর শখ। কিন্তু তার জন্য কি দায় পড়েছে দেবীদাসের যে পঞ্চাশটা টাকা তাকে চাঁদা দিতেই হবে।

বাইরে রৌদ্রতপ্ত পৃথিবী। রিক্ত মৃত্যুপাণ্ডুর বাঙলা দেশ। ওদিকে বন্দরের টিনের চালাগুলো ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে থানার লাল টকটকে বাড়িটা, নিষ্প্রাণ মাটির ফাটা বুকের ভেতর থেকে তার হৃৎপিণ্ডের মতো যেন বেরিয়ে এসেছে একটা রক্তজবা। সেদিকে তাকিয়ে দেবীদাস যেন উদ্দীপ্ত হয়ে গেল।

—জানিস গৌর, থানার বাড়িটার রং এত লাল কেন?

খবরের কাগজের হাঁপানির মহৌষধের বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে গৌরীদাস সবিস্ময়ে মাথা তুলে থাকাল।

জানিস, কেন এতো রাঙা হয়েছে? রক্তে।

—বটে! এবার গৌরীদাস সত্যিই হাঁ করে চেয়ে রইল। দেবীদাসের মগজেও রস-কস বলে কিছু একটা ব্যাপার আছে তাহলে। শচীকান্তের মহিমা আছে সত্যিই। মুকং করোতি বাচালং—

দেবীদাসের সাদা বাটিটা সম্বন্ধে মানুষের হাড় জাতীয় একটি তুলনা গৌরীদাসের মনে এসেছিল। কিন্তু বলতে ভরসা হলো না। কাকার আশ্রয়ে মানুষ, কাকার অনুগ্রহেই কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। সংক্ষেপে ছোট্ট একটা হুঁ দিয়ে সে পাকা চুল কাঁচা হওয়ার একটা যুগান্তকারী বিজ্ঞাপন পড়তে লাগল।

অনেক দূর থেকেই যাত্রার আসরের আলোগুলো চোখে পড়ছে। অতগুলো ডে-লাইট একসঙ্গে কোথা থেকে যে জোগাড় করা গেল একমাত্র সর্বশক্তিমান শচীকান্তই বলতে পারে সে কথা। কেরোসিনের অভাবে আজকাল অন্ধকারেই তলিয়ে থাকে গ্রামগুলো। বাঁশবনের ছায়ায় জংলা পাথর পাথুরে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মানুষ আজকাল চলাফেরা করে—মানুষ, শেয়াল আর সরীসৃপ। কার মন্ত্রবলে সমস্ত জগৎটা যেন আদিম একাত্মতায় ফিরে গেছে। রোজ দু-তিনটে করে সাপে কাটার এজাহার আসে থানাতে—মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পৃথিবীর হিংসা যেন নির্মম হয়ে উঠেছে। ওদিকে মুচিপাড়ায় একটি মেয়ে চিৎকার

করে কাঁদছে, পরশু দিন নিশুত রাতে ওর ঘরের বেড়া ভেঙে শেয়ালে ছেলে চুরি করে নিয়েছে। পরদিন সকালে বাড়ি থেকে তিরিশ হাত দূরেই ছেলের অভুক্ত মাথাটা খুঁজে পাওয়া গেছে। এত কাছে বসে খেয়েছে অথচ একটা আলোর অভাবে ছেলেটাকে বাঁচানো গেল না।

যাত্রার আসরের আলোগুলো অস্বাভাবিক দীপ্তি ছড়াচ্ছে। প্রায় আধ মাইল পর্যন্ত তার রেশ এসে পড়েছে—আকাশের অনেকটা সাদা হয়ে গেছে বিচিত্র একটা আলোর কুয়াশায়! গৌরীদাসের হঠাৎ মনে হলো শচীকান্ত যেন ক্ষতিপূরণ করতে চায়। এতদিনের সঞ্চিত অন্ধকারকে পাঁচ পাঁচটা জোরালো ডে-লাইটের আলো ছড়িয়ে যেন দূর করে দেবার সংকল্প করেছে সে।

আসরের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে কালো কালো মানুষের দল। এত ঝাঁঝালো আলো ওদের চোখে সহ্য হচ্ছে না—ধাঁধা লেগে যাচ্ছে যেন। রাশি রাশি আলোয় ওদের চোখের নিচে কালো কালো ছায়াগুলো আরো বেশি কালো হয়ে পড়েছে, বুকের হাড়গুলো জ্বলে উঠছে ঝকঝক করে। গৌরীদাস ভাবতে লাগল : শরীর দেহ ছাড়িয়ে লোকগুলো যেন অশরীরী হওয়ার চেষ্টা করেছে—সর্বাঙ্গ থেকে ঠিকরে পড়ছে আত্মিক একটা জ্যোতির্ময়তা।

শচীকান্তের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, এ যেন তার মেয়ের বিয়ে। সৌজন্য এবং অমায়িকতার বহর দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে লোকগুলো।

—ওরে বোস, বোস তোরা—বসে পড়। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? তোদেরই তো গান—তোদের জন্যই তো দেড়শো টাকা খরচা করে বৈকুণ্ঠ অধিকারীর দল আনলাম। নে—বসে পড়।

সদাশয়তার সীমা নেই। অর্ধনগ্ন অর্ধভুক্ত মানুষগুলো যেন কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজে পায় না।

শচীকান্তের আদ্দির পাঞ্জাবিটা হাওয়ায় উড়ছে। যুদ্ধের বাজারে অমন চমৎকার আদ্দি কোথায় পাওয়া গেল—সে রহস্য দেবীদাস জানে। একটি প্রঠিটিয়ারিংয়ের মামলায় জেল কেটে বেরুতে একখানি আদ্দি খরচ করতে হয়েছে। কিন্তু শচীকান্তকে মানিয়েছে বেশ—যেন দশ বছর বয়স কমে গেছে।

—বসুন, বসুন, দেবীদাসবাবু, বোসো হে গৌরীদাস। না, না বেঞ্চিতে নয়—এই তো চেয়ার। তারপরেই কানাই, ওদের আর দেরি কত?

কানাই দে নিশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছে না। ঘর্মাক্ত দেহে প্রাণপণে একটা আলোকে পাম্প করছে সে। মুখ ফিরিয়ে শশব্যস্তে জবাব দিলেন, আর বেশি দেরি নেই বড়বাবু, ওদের সাজ হয়ে গেছে। সখীরা এসে পড়বে এক্ষুনি।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন শচীকান্ত। ক্লান্তির একটা নিশ্বাস ফেললেন। তারপর এসে বসলেন দেবীদাসের পাশের চেয়ারটাতে। মদ আর সিগারেটের একটা মিলিত গন্ধ অনুভব করলে দেবীদাস।

আসরে বেহালার ছড়ে টান পড়ছে। টুম টুম করছে তবলা। থেকে থেকে ঝমর ঝমর করে উঠছে করতাল। সব মিলে বেশ একটা অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছে। কালি-পড়া কোটরের ভেতর থেকে চক্ চক্ করে উঠছে কালো মানুষগুলোর চোখ! সমস্ত দিনের অতি-বাস্তব সংঘাতের পরে একটি রাত্রের মায়ালোক।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আর একটা দেবীদাসের দিকে বাড়িয়ে দিলেন শচীকান্ত।

—'দুঃশাসনের রক্তপান' লাগিয়ে দিলাম। ভালোই হবে—কী বলেন সরকার মশাই?

আপ্যায়িত হয়ে দেবীদাস হাসল : আজ্ঞে হাঁ, ভালো হবে বৈকি!

বেহালার ছড়ে সুরের আবেশ এসেছে। তবলার তাল পড়েছে। তারপরেই আসরের পেছন থেকে গানের আওয়াজ। হস্তিনাপুরে রাজসভার নর্তকীদের প্রবেশ। ঘুঙুরের শব্দ আর গানে যেন ঝড় বয়ে গেল।

শচীকান্ত বললেন, সাবাস ভাই। গলার স্বরে জড়তা। নেশাটা বেশ ভালো করে জমে উঠেছে। দেবীদাসের দিকে ঘোলাটে চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লাগছে?

দেবীদাস সংক্ষেপে বললেন, বেশ।—মনের মধ্যে পঞ্চাশটা টাকার শোক তখন কাঁটার মতো বিঁধছে। কিন্তু এ কথা সত্যি যে, দলটা ভালো গায়। শচীকান্তের রুচি আছে।

সমস্ত পৃথিবীটা বদলে গেছে মুহূর্তে। আলো আর বাঙলা দেশের ছোট এই গ্রামটা হাজার হাজার বছর আগেকার কুরুক্ষেত্রে ফিরে চলে গেছে। অর্জুনের কপিধ্বজ রথের চাকায় গুড়িয়ে যাচ্ছে কৌরব সৈন্য—পাঞ্চজন্যের শব্দে দূর রাজপ্রাসাদে বসে থর থর করে কেঁপে উঠছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। কর্ণ এসে বলছেন : ভয় নেই। সূতকূলে আমার জন্ম—সেজন্য দায়ী দৈব। কিন্তু আমার পৌরুষ—সে আমার নিজস্ব গৌরব।

শচীকান্ত বললেন, বাঃ বাঃ, কর্ণ বেড়ে অ্যাক্ট করছে। ওকে একটা মেডেল দিতে হবে সরকার মশাই।

ইতিহাস চলেছে বজ্রগর্জিত ঝড়ের আবেগে। রক্ত-তরঙ্গিত কুরুক্ষেত্র। একটির পর একটি মহারথীর বীর শয্যায় ঘুমিয়ে পড়েছে। শকুনির হাতের পাশা আর ভারতবর্ষের সমস্ত রাজমুকুট নিয়ে জুয়া খেলছে। আত্মগ্লানিতে পীড়িত হয়ে দুর্যোধন বলছেন : মাতুল, তোমার জন্যই আজ আমার এই সর্বনাশ হলো!

শচীকান্ত ঝিমুতে ঝিমুতে বললেন, না দুর্যোধনটা কোনো কাজের নয়। মুখটা বড্ড বেশি বোকাটে।

ওদিকে দ্রৌপদীর চোখে ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে আগুন। অযত্ন-বিন্যস্ত রুক্ষ

চুল তার সর্বাঙ্গে যেন প্রলয়ের মেঘের মতো ভেঙে পড়েছে। সেই দীপ্ত নারীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে দিগ্বিজয়ী অর্জুন পর্যন্ত সলজ্জ দীনতায় মাথা নিচু করে আছেন।

—শোনো কেশব, শোনো ভীমসেন—শোনো ধনঞ্জয়! প্রকাশ্য রাজসভায় সেই মর্মান্তিক অপমানের পরে শুধু তোমাদের মুখ চেয়েই পাঞ্চালী আত্মহত্যা করেনি। কিন্তু আর নয়। দুঃশাসনের রক্তরঞ্জিত হাতে যদি বেণীবন্ধন না করতে পারি, তাহলে জেনে রেখো, সতীর অভিশাপে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতল সমস্ত ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

সমস্ত আসরটা গম গম করে উঠেছে। ঝিমন্ত চোখ তুলে শচীকান্ত বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকালেন। মানুষগুলো সমস্ত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে—থেকে থেকে বেহালার ছড়ে এক একটা আর্তনাদ যেন দ্রৌপদীর বজ্রবাণীর প্রতিধ্বনি করছে।

অদ্ভুত জমেছে গান। দেবীদাস ভুলে গেছে নিজেকে—এমনকি পঞ্চাশ টাকার ক্ষতিটাও এখন আর তত তীব্র বলে মনে হচ্ছে না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ফিরে এসেছে বাঙলা দেশে। গৌরদাসের মনে হতে লাগল—সারা পৃথিবী জুড়েই যেন দ্রৌপদীর মতো আর্তনাদ উঠছে আজকে। কিন্তু তার অভিশাপে কি স্বর্গ-মর্ত্য, পাতাল ভস্ম হয়ে যেতে পারে? কে বলবে।

শচীকান্তের আদ্দির পাঞ্জাবিটা হাওয়ায় উড়ছে। দীপ্ত হয়ে উঠেছে নেশায় নির্বাপিত চোখ দুটো। ইতিহাসের চাকা চলেছে ঘুরে। ওদিকে রাত শেষ হয়ে গেল। ডে-লাইটের আলোগুলো ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে। ওপাশে নদীর বুক থেকে শির শির করে আসছে শেষ রাত্রির হাওয়া। মানুষগুলোর রাত-জাগা চোখ জ্বালা করছে, কিন্তু সে চোখ তারা বুঝতে পারছে না। ঘটনার গতি উড়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে—একটুখানি চোখ বন্ধ করলেই তারা পিছিয়ে পড়বে।

শচীকান্ত একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, সাবাস—সাবাস।

চরম সঙ্কট মুহূর্ত। দ্রৌপদীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবার সময় এসেছে। মানুষগুলো প্রতীক্ষা করছে নিশ্বাস বন্ধ করে। ভীমের গদার গায়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল দুঃশাসন। আসরে চারিদিকে কটাকট হাততালি।

কিন্তু বিস্ময়ের আরো বাকি আছে। দুঃশাসনের বুকে বিঁধছে ভীমের খরনখর। আর কী আশ্চর্য—ভীমের নখের মুখে উছলে উঠছে রক্ত—হাঁ-রক্তই তো!

সেই রক্ত মুখে মেখে পৈশাচিক মূর্তিতে ভীম উঠে দাঁড়াল। দর্শকেরা বিস্ফারিত বিহ্বল চোখে তাকিয়েই আছে।

একটা প্রচণ্ড অট্টহাসি করে ভীম বললে : এই রক্তাক্ত হাতে দ্রুপদ-নন্দিনীর বেণী বেঁধে দেব। প্রতিশোধ-যজ্ঞের প্রথম আহুতি হলো আজকে।

দশ মিনিট ধরে টানা হাততালি। শচীকান্ত চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে

উঠেছেন। আদ্দির পাঞ্জাবির হাতায় খানিকটা পানের পিক লেগেছে যেন, রক্তের ছোপ। জড়িত গলায় বললেন—চমৎকার, চমৎকার, চমৎকার!! সরকারমশাই, দশকে দল একটা করে মেডেল দিয়ে দিন। সাবাস ভাই সাবাস!

বেহালা ফেলে অধিকারী উঠে এলো তড়িৎগতিতে। আভূমি নমস্কার করে বিগলিত হাস্যে বললে, হুজুরের অনুগ্রহ।

ভোরের আলোয় ঝলমল করছে পৃথিবী। সারা রাত জেগে বসে থেকে সমস্ত শরীর আড়ষ্ট আর অসাড় হয়ে উঠেছে। মস্ত একটা হাই তুলে দেবীদাস বললেন, চল গৌর, যাওয়া যাক।

ধুলোয় ভরা পথ দিয়ে দুজনে এগিয়ে চলল নিঃশব্দে! ধানকাটা মাঠ থেকে হাওয়া এসে খেলা করছে গৌরদাসের বিশৃঙ্খল চুলের মধ্যে। দেবীদাস অন্যমনস্কের মতো বললেন, বেশ গাইলে, না-রে?

—হাঁ।

একটু এগিয়ে মুচিপাড়া। পুত্রহারা মা ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে এখনো। তার ছেলেকে চুরি করে খেয়েছে শেয়ালে, আর খেয়েছে তার ঘরের পাশে বসেই। আকাশভরা এত আলো—এমন অকৃপণ সূর্য। রাত্রির অন্ধকারের কোথায় মিলিয়ে যায় এই আলো। এই সূর্য ডুবে যায় কোন অতল সমুদ্রে?

দেবীদাস বললেন, চল, লক্ষ্মণ মুচিকে একটা ডাক দিয়ে যাই। দু জোড়া জুতো পাঠিয়েছিলাম—দিয়ে গেল না তো।

ওরা মুচিপাড়ায় পা দিতেই তিন-চারটে কুকুর চিৎকার করে উঠল তারস্বরে। প্যাঁক প্যাঁক করে ডোবায় গিয়ে নামল কতকগুলো পাতিহাঁস। প্রকাণ্ড একটা মাটির গামলায় নীল জল, চামড়া ধোয়া গন্ধ উঠছে তার থেকে। কতকগুলো ছোটবড় চামড়া ট্যান করার জন্য বাঁশের খুঁটো দিয়ে আঁটা। মুচিদের ভাঙা ঘরগুলো ভগবানের দয়ার ওপরে আত্মসমর্পণ করে বেঁকে-চুরে অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

—লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ আছিস?

ঘাটের দিক থেকে একটি ষোড়শী মেয়ে জল নিয়ে আসছিল, মানুষের গলা শুনেই বিদ্যুৎগতিতে কোথায় মিলিয়ে গেল আবার। আর একসঙ্গেই চমকে উঠল দেবীদাস আর গৌরদাসের দৃষ্টি, ছলছল করে উঠল রক্ত। মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে একফালি কাপড় নেই—কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে। ভেতর থেকে সন্ত্রস্ত নারীকণ্ঠ শোনা গেল : লক্ষ্মণ বেরিয়ে গেছে।

—ও আচ্ছা।

দুজনে আবার নিঃশব্দে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। গৌরদাসের মনে হলো :

যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্র করছে, তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে?

রাত্রি জাগরণে দেবীদাসীর মুখটা অদ্ভুত বিষণ্ন আর পাণ্ডুর। ওদিকে ফসলহীন রিক্ত মাঠ। তারই ভাঙা আলের ওপর দিয়ে একদল কাজ করতে চলেছে—তাদের ধারালো হেঁসোগুলোতে সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠেছে। অকারণে—অত্যন্ত অকারণে বড় বেশি ভয় করতে লাগল গৌরদাসের। অমন ঝকঝকে করে কেন হেঁসোত শান দেয় ওরা?